অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ■ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১১ চৈত্র ১৪৩০
২৫ মার্চ ২০২৪

বাণী

আজ ভয়াল ২৫ মার্চ, গণহত্যা দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ সারাদেশে ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড চালায়। বাঙালির মুক্তি আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে কাপুরুষের দল সেদিন নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙালির ওপর নির্বিচারে হামলা চালায়। এ গণহত্যায় শহিদ হন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন বাহিনী, বিশেষ করে পুলিশ ও তৎকালীন ইপিআর-এর সদস্যসহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার অগণিত মানুষ। এ দিনটিকে গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। দিবসটি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মত্যাগের মহান স্বীকৃতির পাশাপাশি তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে চরম প্রতিবাদের প্রতীক।

আজকের এ দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় দীর্ঘ নয়মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় আমাদের মহান স্বাধীনতা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি ২৫ মার্চ কালরাতের নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মম গণহত্যার শিকার সকল শহিদদের। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থকসহ সকল শ্রেণি-পেশার দেশপ্রেমিক জনগণকে, যাঁদের অসামান্য অবদান ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি প্রিয় স্বাধীনতা।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সরকার গঠনে আহ্বান জানানোর পরিবর্তে তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সেই নির্বাচনে বিজয়ী শেখ মুজিবের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি শুরু করে এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসলেও বাঙালি জাতিকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে পর্দার অন্তরালে গণহত্যার পরিকল্পনা করতে থাকে, যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় বালুচিস্তানের কসাই খ্যাত জেনারেল টিক্কা খানকে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়। 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে অভিযানটি পরিচালনার মাধ্যমে তারা স্বাধীনতাকামী ছাত্রজনতার প্রতিরোধকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। এর ব্যাপ্তি ছিল ঢাকাসহ সারাদেশে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানাসহ (বর্তমানে বিজিবি সদর দপ্তর) যশোর, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সৈয়দপুর, কুমিল্লা, সিলেট, চট্টগ্রামে একযোগে গণহত্যা চালায়। বিশ্বের সকল গণমাধ্যমেই গুরুত্বের সাথে স্থান পায় এ গণহত্যার খবর। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার আগে তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান, যার পথ ধরে শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ।

মুক্তিযুদ্ধকালীন ন'মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের শিকার হন ত্রিশ লক্ষ মানুষ এবং নির্যাতিত হন দুই লক্ষ মা-বোন। হত্যা-নিপীড়নের ভয়াবহতায় এক কোটি বাঙালি আশ্রয় নিয়েছিল প্রতিবেশী দেশ ভারতে। একাত্তরের বীভৎস গণহত্যা শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বমানবতার ইতিহাসেও একটি কালো অধ্যায়। এমন গণহত্যা আর কোথাও যাতে না ঘটে, গণহত্যা দিবস পালনের মাধ্যমে সে দাবিই বিশ্বব্যাপী প্রতিফলিত হবে। আমি ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের যে সকল দেশে এখনো গণহত্যা হচ্ছে তার নিন্দা জানাই। বিশ্বব্যাপী গণহত্যা বন্ধে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানাই।

মুক্তিযুদ্ধের মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বাংলাদেশ আজ এগিয়ে চলেছে উন্নতি আর সমৃদ্ধির পথে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশকে ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প ২০৪১' ঘোষণা করেছেন। এ লক্ষ্য অর্জনে আমি দলমত নির্বিশেষে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কার্যকর অবদান রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে পারলেই আমরা একাত্তরের গণহত্যায় জীবনদানকারী প্রতিটি প্রাণের প্রতি জানাতে পারি আমাদের চিরন্তন শ্রদ্ধাঞ্জলি।

আমি গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১ চৈত্র ১৪৩০
২৫ মার্চ ২০২৪

বাণী

আজ ২৫ মার্চ 'গণহত্যা দিবস'। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে বিশ্বের বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করি সেই কালরাতে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদদের, যাদের তাজা রক্তের শপথ বীর বাঙালিদের অস্ত্রধারণ করে স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছর ধরে শৃঙ্খলিত বাঙালি জাতিকে মুক্ত করার প্রয়াসে সারা জীবন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ প্রথম গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন। সেই থেকে '৫২-এর ভাষা আন্দোলন, '৫৪-এর একুশ দফা, '৬২-এর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-এর ছয় দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ সকল আন্দোলন সংগ্রামে অত্যন্ত দূরদর্শীতার সঙ্গে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। তিনি ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে ঘোষণা করেছিলেন, 'আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় এদেশটির নাম হবে পূর্ব-পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু মাত্র বাংলাদেশ।' তিনি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দলকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করেছিলেন এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পুরো জাতিকে প্রস্তুত করেছিলেন। জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ '৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু, পাক-সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা টালবাহানা শুরু করে। বৈঠকের মাধ্যমে সময় ক্ষেপণ করে নিরস্ত্র বাঙালি নিধনের উদ্দেশ্যে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ২রা মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন; ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন এবং ১৫ই মার্চ থেকে ৩৫ দফা নির্দেশনা পালনের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশ সারা পূর্ব-বাংলায় অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তাঁর আদিষ্ট পথেই পরিচালিত হতে থাকে। বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার শাসন সম্পূর্ণ অচল হয়ে যায়। ইয়াহিয়া-ভুট্টো বারবার সমঝোতার প্রস্তাব দিতে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা ক্ষমতার মোহ ত্যাগ করে এদেশের মুক্তিকামী মানুষের পক্ষে অটল থাকেন। ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে সারা দেশে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়।

২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যেই ইয়াহিয়া গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। মধ্য রাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক নিয়ে 'অপারেশন সার্চ লাইট' পরিচালনা করে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যা করতে শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা এবং রাজারবাগে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ছাত্র-শিক্ষক, বাঙালি পুলিশ ও সামরিক সদস্যদের হত্যা করতে থাকে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। এর অব্যবহিত পূর্বেই জাতির পিতা স্বাধীনতার চূড়ান্ত ঘোষণা বার্তা লিখে যান- 'ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। ---চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।'- যা প্রথমে ইপিআর এর ওয়্যারলেস মাধ্যমে প্রচারিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে এই বার্তা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানিরা বন্দি নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-এর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়; এমনকি তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। ১৩ই জুন পাকিস্তানি সাংবাদিক অ্যান্থনি মাসকারেনহাস যুক্তরাজ্যের 'The Sunday Times' পত্রিকার প্রথম পাতায় 'GENOCIDE' শিরোনামে বাঙালিদের উপর পাকিস্তানিদের নির্মম বর্বরতার বাস্তব চিত্র নির্ভর একটি বিস্তারিত নিবন্ধ প্রকাশ করলে বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়। দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হয়, ২ লাখ মা-বোন সম্ভ্রম হারায় এবং গোটা দেশ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।

বাঙালি জাতির পিতা, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের নির্জন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। শূণ্য হাতে বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর সহায়তা নিয়ে ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন করেন, অবকাঠামো পুনস্থাপন ও উন্নয়ন করেন, এবং উৎপাদন খাত ও অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করান। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের স্বীকৃতি প্রদান করে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, '৭১-এর পরাজিত স্বাধীনতা বিরোধী চক্র তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকে। '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট আরেক কালরাতে ঘাতকদের নির্মম বুলেটের আঘাতে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শাহাদাৎ বরণ করেন। খুনি মোস্তাক-জিয়া ও তাদের উত্তরসূরিরা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে দেশে স্বৈরশাসন কায়েম করে। বিএনপি ২৫শে মার্চে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের কুশিলব, মানবতা বিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধী এবং জাতির পিতার খুনিদের মহান সংসদে বসিয়ে এবং তাদের গাড়িতে স্বাধীন বাংলাদেশের পবিত্র পতাকা তুলে দিয়ে বাঙালি জাতির গর্বিত ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে।

দীর্ঘ ২১ বছর আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ জনগণের বিপুল ভোটে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। ১৯৯৮ সালের ৫ই অক্টোবর আমরা জাতিসংঘের গণহত্যা বিরোধী কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করি। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে শান্তির সংস্কৃতির উপর রেজুল্যুশন গ্রহণের প্রস্তাব করি, যা ১৯৯৯ সালে গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী জাতিসংঘ ২০০০ সালকে 'আন্তর্জাতিক শান্তির সংস্কৃতির বর্ষ' এবং ২০০১-২০১০ সময়কে 'শান্তির সংস্কৃতি এবং অহিংস দশক' ঘোষণা করে। আমরা ২০০৮ সাল থেকে সবকটি নির্বাচনে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে গত ১৫ বছরের বেশি সময় একটানা তাঁদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য কাজ করছি। এরই মধ্যে আমরা 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতা বিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেছি। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করেছি, ফলে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলের পথ বন্ধ হয়েছে। ২০১৩ সালে প্রকাশিত "The Blood Telegram: Nixon, Kissinger, and a Forgotten Genocide"-শীর্ষক গ্রন্থে তৎকালীন ঢাকাস্থ আমেরিকার কনসাল জেনারেল জনাব আর্চার কে ব্লাড-এর স্টেট ডিপার্টমেন্টে লেখা নিয়মিত প্রতিবেদনেও বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের পরিচালিত বর্বরতম গণহত্যার ভয়াল চিত্র উঠে এসেছে। আমরা ২৫শে মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছি। প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারে গণহত্যা এড়াতে ভীত-সন্ত্রস্ত ১১ লাখের বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়েছি। বিশ্বের যেকোন স্থানে সংঘটিত গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমরা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করেছি। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'। আমরা 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছি; ভবিষ্যত প্রজন্ম এই পরিকল্পনাকে সময়োপযোগী করে বাস্তবায়ন করতে পারবে।

আমরা যুদ্ধ ও সংঘাত চাই না, নর-নারী-শিশু হত্যা আমাদের তীব্রভাবে ব্যথিত করে। আমরা যুদ্ধ চাই না। আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি। টেকসই শান্তি বিরাজমান থাকলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শান্তির নীতি অনুসরণ করি। সকল প্রকার বৈষম্য ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে আমি দেশবাসীসহ বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানাই ।

আমি 'গণহত্যা দিবস' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

জেনোসাইডের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি কেন প্রয়োজন

অজয় দাশগুপ্ত

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ এবং পরের দিনগুলোতে ঢাকা এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তান আর্মি সামরিক পদক্ষেপকে 'ক্রুয়েল ক্র্যাকডাউন' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন সে সময় ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড। হানাদারদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট, পদক্ষেপ পরিকল্পিত– জেনোসাইড। নারী-পুরুষ-শিশুদের ওপর তারা ট্যাংক, মেশিনগান, বাজুকা, রাইফেল, গ্রেনেড এবং অন্যান্য ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র ব্যবহার করেছে। আওয়ামী লীগ সমর্থক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, শিক্ষক-ছাত্র- নির্বিচারে হত্যা করেছে। ঢাকা পরিণত হয়েছে ভুতুড়ে নগরে। চারদিকে গুলি, আগুনের লেলিহান শিখা, মানুষের আর্তচিৎকার। প্রাণ বাঁচাতে শহর ছেড়ে পালাচ্ছে মানুষ, কিন্তু সর্বত্র মৃত্যুর হানা।

'উইটনেস টু সারেন্ডার' গ্রন্থে পাকিস্তান আর্মির পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জনসংযোগ অফিসার সিদ্দিক সালেক লিখেছেন– ২৫ মার্চ রাতে অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়নের জন্য কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয় সেনা বহর। সৈন্যরা তেজগাঁও ফার্মগেটে প্রথম বাধার সম্মুখীন হয়। হাজার হাজার আওয়ামী লীগ কর্মী ব্যারিকেড দিয়ে জয় বাংলা স্লোগান দিচ্ছিল। গুলি চালিয়ে তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়। জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলসহ (বর্তমানে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রাবাসগুলো দখলে আসে রাত চারটার দিকে। তবে তার আগেই শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নেওয়া হয় তাঁর ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন থেকে। কিন্তু তিনি ততক্ষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়ে ফেলেছেন। [উইটনেস টু সারেন্ডার, পৃষ্ঠা ৭৫]

২৫ মার্চের ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ডে। বিজ্ঞানী ড. মোজাম্মেল হোসেন লিখেছেন, 'বৃষ্টির মত গুলি। আরও শুনি গোলার শব্দ। রাজারবাগ পুলিশ লাইন পুড়ছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিজস্ব রেডিও যোগাযোগ মাধ্যম ইন্টারসেপ্ট করে শুনছি– দি বিগ ফিশ হ্যাজ বিন কট। বুঝতে পারি বঙ্গবন্ধু বন্দি হয়েছেন। সেনাদের প্রতি নির্দেশ– নো প্রিজনার, ওয়াইপ দেম আউট। দৈনিক পিপল পত্রিকা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। [বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৩-৩৫৪]

নারকীয় হত্যাযজ্ঞের আরেকটি বিবরণ– ২৬ মার্চ সকাল ১১ টা। হানাদার সৈন্যরা জগন্নাথ হলের ৫ জনকে ধরে নিয়ে এলো। তাদের দিয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত লাশগুলো ট্রাকে তুললো। জগন্নাথ হলের মাঠে আগেই বিরাট গর্ত করে রাখা হয়েছিল। লাশগুলো ফেলানো হলো সে গর্তে। সেই পাঁচ জনকেও গুলি করলো। [বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, অষ্টম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৩৮]

২৫ মার্চ গণহত্যায় অংশগ্রহণকারীদের একটি দল ২৬ মার্চ সকালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অফিসার্স মেসে পৈশাচিক উল্লাস করছে। কমলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে ক্যাপ্টেন চৌধুরী বলে উঠল– বাঙালিদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, আর কোনো ঝামেলা হবে না। মেজর মালিক যোগ করল– হ্যাঁ, বাঙালিরা কেবল শক্তির ভাষা, অস্ত্রের ভাষা বোঝে, ইতিহাস সেটাই বলে। [উইটনেস টু সারেন্ডার, পৃষ্ঠা ৭৮]

কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য স্থান দখলে এলেও বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে উন্মেষ ঘটেছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরলস চেষ্টা ও সাধনায়, স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে মানুষের মনে তা মুছিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারও ছিল না। এ চেতনা অজেয়।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১১ টার দিকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেলুচিস্তানের কসাই হিসেবে কুখ্যাত লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের নির্দেশ ছিল– 'আজ রাতেই সামরিক অভিযান'। কুখ্যাত অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়নের এটা ছিল সবুজ সংকেত। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ঢাকা থেকে ততক্ষণে গোপনে ইসলামাবাদ চলে গেছেন। কয়েকদিন আগে ঢাকায় মোতায়েন পাকিস্তানি আর্মির এক পদস্থ অফিসার দম্ভভরে বলেছিলেন– পাকিস্তানি আর্মির সক্ষমতা ও শৃঙ্খলা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করা অনুচিত, তারা বিশ্ব সেরা। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের সেই অমর উক্তি– 'সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না... যার যা আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা কর।'

তিনি সহকর্মীদের এটাও বলেছিলেন, পাকিস্তান আর্মি কী করবে, যদি সাড়ে সাত কোটি মানুষ রুখে দাঁড়ায়?'

বাংলাদেশের জনগণ নেতার নির্দেশ পালন করেছিল অক্ষরে অক্ষরে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে ৩ মার্চ নির্ধারিত জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলে (১ মার্চ, দুপুরে) মুহূর্তে পূর্ব পাকিস্তান কিংবা পূর্ব বাংলা নামে পরিচিত এ ভূখণ্ড পরিণত হয়ে যায় বাংলাদেশ-এ। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার প্রচারের পর স্বল্প সময়ের মধ্যে শহর-বন্দর-গ্রামে যত মিছিল-সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার সমতুল্য নজির বিশ্বের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে মিলবে না। বঙ্গবন্ধু এভাবেই দেশবাসীকে প্রস্তুত করেছিলেন, উপযুক্ত সংগঠন ও নেতৃত্ব গড়ে তুলেছিলেন। ২ মার্চ সকালে তাঁর নির্দেশে ২৩ বছর আগে তাঁরই হাতে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় উত্তোলন করেন বাংলাদেশের পতাকা, ৩ মার্চ তাঁর উপস্থিতিতে ঘোষণা হয় স্বাধীনতার ইশতেহার– বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার মহান সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক, বিশ্বকবির 'আমার সোনার বাংলা...' জাতীয় সংগীত। আর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে তাঁর বজ্রকণ্ঠের ঘোষণা– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' কোটি কোটি মানুষের মনের কথা প্রকাশ পায় এতে। বহিঃপ্রকাশ ঘটে বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্রের অদম্য আকাঙ্ক্ষার।

১ মার্চ থেকেই ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বরের বাসভবনটি পরিণত হয়েছিল সামরিক জান্তার বিকল্পসরকারের কেন্দ্রে, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনা মেনে চলে প্রশাসন, আইন শৃঙ্খলা বাহিনী, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নারী-পুরুষ, ব্যবসায়ী-শিল্পপতি এবং বেতার-টেলিভিশন-সংবাদপত্রের সাংবাদিক ও কলাকুশলীরা। তারা বুঝে গিয়েছিল বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠই বাঙালির কণ্ঠ, তিনিই এ ভূখণ্ডকে নিয়ে যাবেন পরম কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে– স্বাধীনতা। মহাত্মা মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতবর্ষের জনগণকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, জাগিয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে জনগণকে স্বাধীনতার জন্য কেবল ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত করেন নাই, একইসঙ্গে তিনি কার্যত পরিচালনা করেছেন একটি ডি-ফ্যাক্টো সরকার, যা ছিল আইনসম্মতও। কারণ ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তাঁর ছিলো জনগণের ম্যান্ডেট। ২৩ মার্চ তিনি নিজ বাসভবনে 'বাংলাদেশের পতাকা' উত্তোলন করেন, স্বাধীন বাংলা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সমগ্র বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ওড়ে লাল-সবুজ-সোনালি পতাকা। পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের জনসংযোগ অফিসার সিদ্দিক সালেক তার উইটনেস টু সারেন্ডার গ্রন্থে লিখেছেন, '২৩ মার্চ মার্শাল ল' সদর দফতর ও গভর্নর হাউস ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানের পতাকা দেখা যায়নি। বেতার-টেলিভিশনে গাওয়া হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি...' গান [উইটনেস টু সারেন্ডার, পৃষ্ঠা ৬৭]

২৫ মার্চ অপারেশন সার্চলাইট বাস্তবায়ন শুরুর পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জোনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ ভাষায় বলেছিলেন, 'ওই লোক এবং তার দল আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের শত্রু। এই অপরাধের বিচার হবেই। দিস টাইম হি উইল নট গো আনপানিশড। আওয়ামী লীগ ইজ ব্যান্ড।

পোয়েট অব পলিটিক্স:

কিন্তু পাকিস্তানের শাসকরা ভুল পথে চলেছিল। বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের প্রতি বঞ্চনা ও অবিচারের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করেন। স্বাধীনতা কেন প্রয়োজন, শোষণ ও বঞ্চনার অবসান কীভাবে ঘটতে পারে, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে আন্দোলন কীভাবে পরিচালনা করতে হবে– এ সব বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দিয়ে জনগণকে তিনি মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। নিউজউইক সাময়িকী ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল লিখেছিল– 'তিনি নিজেকে কখনও পণ্ডিত দাবি করেন না। তিনি রাজনীতির কবি– পোয়েট অব পলিটিক্স।'

নিউজউইক-এ লরেন্স জেনকিনস ১২ এপ্রিল লিখেছিলেন– 'মার্চের একদিন ৫১ বছর বয়সী এই নেতার বাসভবনের সামনে একদল মেডিকেল কলেজ ছাত্র স্লোগান দিচ্ছিল– জয় বাংলা। একদল বিদেশী সাংবাদিককে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন। এ সময়ে তিনি বলেন, আমার জনগণ একতাবদ্ধ। তাদের থামানো যাবে না। আপনারা কি মনে করেন, মেশিনগান আমাদের মানুষের হৃদয় ও চেতনাকে স্তব্ধ করে দিতে পারবে?

লরেন জেনকিনস লিখেছেন, বাংলাদেশে মার্চ মাসে অভূতপূর্ব গণজাগরণ ঘটেছে। তেইশ বছর আগে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সংখ্যাগুরু বাঙালিরা সংখ্যালঘু পাঞ্জাবিদের দ্বারা শোষিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত ও প্রতারিত হয়েছে।... ১ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন বাতিল করার পর রাতারাতি পুরো ঢাকা থেকে পাকিস্তানের সাদা-সবুজ পতাকা অদৃশ্য হয়ে যায়। তার পরিবর্তে স্থান পায় বাঙালিদের নতুন পতাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে পতাকার নকশা করেছে তাতে রয়েছে গাঢ় সবুজ, জমিনের মাঝে লাল বৃত্ত, আর বৃত্তের মাঝে সোনালি রংয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র।

ঢাকায় গণহত্যা অভিযানের বিষয়ে তিনি লিখেছেন, 'সেনাবাহিনী কোনো ধরনের সতর্কতা ছাড়াই আক্রমণ করে। রাতের আঁধারে সৈন্যভর্তি ট্রাকগুলো ঢাকা শহরের সবপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। বসতবাড়িগুলো নির্বিচারে মেশিনগানের গুলির কবলে পড়ে, ট্যাংকগুলো ক্ষ্যাপা কমান্ডারদের ইচ্ছায় গোলাবর্ষণ করতে করতে রাস্তায় চলতে লাগল। এটা ছিল সন্ত্রাস আর প্রতিশোধ স্পৃহার উন্মত্ত প্রকাশ। আমরা দেখেছি ও শুনেছি নিরস্ত্র বেসামরিক মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবহার হতে। এর কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। যেমন যুক্তি থাকতে পারে না বিশ্বের দরিদ্রতম জনসাধারণের কুড়েঘর নির্মমভাবে জ্বালিয়ে দেয়ার। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে যা কিছু দরকার তার চেয়ে অনেক বেশি কিছুই আমরা নিজেদের চোখে দেখেছিলাম। [নিউজউইক, ১২ এপ্রিল১৯৭১]

প্রাণ বাঁচাতে লাখ লাখ নারী-পুরুষ-শিশু আশ্রয় নিয়েছিল ভারতে। কিন্তু শরণার্থী শিবিরগুলোর পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। ক্যাম্পে ক্যাম্পে মৃত্যুর হানা। আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন। একটি শিবিরে তিনি জানতে চান– 'এখন আপনাদের সবচেয়ে জরুরি কি সহায়তা প্রয়োজন?' বিষণ্ন বদনে পরিচালক উত্তর দেন– 'Creamatorium'. [`দিব্লাড টেলিগ্রাম, গ্যারি জে ব্যস, পৃষ্ঠা ২২৯]

প্রতিদিন, প্রতিমূহূর্তে এত এত মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে, তাদের শেষকৃত্য সম্পাদনের জন্যই প্রয়োজন এমন যন্ত্র!

যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে এডওয়ার্ড কেনেডি সিনেটে অভিযোগ করেন– 'পাকিস্তান জোনোসাইড পরিচালনা করছে।...যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র সহায়তা এ জন্য ব্যবহার করছে পাকিস্তান।' তিনি বলেন, 'America`s heavy support of Islamabad is nothing short of complicity in the human and political tragedy of East Bengal.' [দি ব্লাড টেলিগ্রাম, পৃষ্ঠা ২৩৪-২৩৫]

পাকিস্তানের কারাগার থেকে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি মুক্ত স্বদেশে ফিরে রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আমার দেশ স্বাধীন হয়েছে। আজ আমার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে। পাকিস্তানি সৈন্যরা আমার ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করেছে। এমন গ্রাম নাই যেখানে আগুন দেয় নাই। আজ বহু ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও সহকর্মীকে আমি দেখছি না। এত বেসামরিক লোককে হত্যা করার নজির আর নাই।'

নয় মাসের বেশি পাকিস্তানের কারাগার নিঃসঙ্গ জীবন কেটেছে তাঁর। এ সময়ে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কেটেছে বন্দিজীবন। বৃদ্ধ পিতা-মাতাও হানাদার বাহিনীর নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি। টুঙ্গিপাড়ার বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি দৌহিত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের জন্মও হয়েছে মা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠকন্যা শেখ হাসিনার বন্দিজীবন চলাকালে। কিন্তু এই কঠিন সময়েও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গমাতা ফজিলাতুন নেছা মুজিবের দুই তরুণ পুত্র শেখ কামাল ও শেখ জামাল মুক্তিবাহিনীর লাখ লাখ সদস্যর পাশে থেকে লড়েছেন বীরের মতো। বঙ্গবন্ধু ১০ জানুয়ারি ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে অশেষ কষ্ট-যন্ত্রণা সহ্য করা পরিবারের সদস্যদের কাছে যাননি, তিনি সরাসরি হাজির হয়েছেন বাংলাদেশের মানুষের কাছে। তাদের উপস্থিতিতে তিনি বলেন, 'বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এ দেশের প্রায় সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে। হাজার হাজার মা-বোনের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে। বিশ্ব এ সব ঘটনার সামান্য কিছুমাত্র জানে। বিশ্বকে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম কুকীর্তির তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর কার্যকলাপের সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য আমি আবেদন জানাচ্ছি।'

মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে বঙ্গবন্ধুর উদ্যোগ:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য আইন পাস করেছিলেন। দালাল আইনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অনেক সহযোগীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। বিচার কাজও শুরু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর বিচার কাজ থেমে যায়, গণহত্যা-ধর্ষণ-লুটপাট-অগ্নিসংযোগের প্রমাণসহ আটকদের কেবল মুক্ত করে দেওয়া নয়, সক্রিয় রাজনৈতিক-সামাজিক জীবনেও ফিরে আসার সুযোগ করে দেওয়া হয়। মুক্ত স্বদেশে এই অপরাধ সংঘটিত করেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের অন্যতম হোতা, খুনি খন্দকার মোশতাকের যাবতীয় দুষ্কর্মের সহযোগী জিয়াউর রহমান। তিনি কেবল দালাল আইন বাতিল করেননি, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে সরাসরি যুক্তদের বিচারের যে কোনো ধরনের উদ্যোগ বন্ধ করার জন্য দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে (যেখানে বিএনপি ছিল দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের অধিকারী, জিয়াউর রহমান এই দলের চেয়ারম্যান ও সর্বময় ক্ষমতাধর) কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করেছিলেন। এটা ছিল গুরুতর সংসদীয় পাপ। শুধু তাই নয় পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী যে পবিত্র ধর্ম ইসলামের অপব্যাখ্যা-অপব্যবহার করেছিল, গণহত্যার কাজে বাংলাদেশে এ ভ্রান্ত মতের যে অনুসারীদের সহযোগী হিসেবে ব্যবহার করেছিল তাদের ফের রাজনৈতিক দল গঠন করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। অপরদিকে বহুবিধ চক্রান্ত, গণতন্ত্র হত্যা ও জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে দুই দশকের বেশি সময় ধরে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগকে রাখা হয় ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনতার জয় হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার জয় হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শের অনুসারীদের জয় হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে। একাত্তরের ঘাতকদের একটি অংশের বিচার সম্পন্ন হয়েছে। আরও অনেকে বিচারের অপেক্ষায়।

তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে, পাকিস্তান বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালনার গুরুতর অপরাধের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চায়নি। যুদ্ধাপরাধে জড়িত কারও বিচার করেনি। পাকিস্তানের দুই যুগে আমাদের এ ভূখণ্ড থেকে লুণ্ঠনকৃত সম্পদের কানাকড়িও তারা ফেরত দেয়নি। এমনকি অভিন্ন সম্পদের ন্যায্য হিস্যাও দেয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র জড়িত বলেই কী:

এটাও দুর্ভাগ্য যে, জাতিসংঘ এবং আরও অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত জোনোসাইডের জন্য পাকিস্তান এবং তার সহযোগী দেশগুলোকে দায়ী করে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ২৫ মার্চ জেনোসাইড দিবস হিসেবে পালনের দাবিও এখন পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। নেদারল্যান্ডস-এর সাবেক পার্লামেন্ট সদস্য ও মানবাধিকার আন্দোলনের সংগঠক হ্যারি ভ্যান বোমেল ২০২৩ সালের মে মাসে ঢাকা সফরকালে অভিযোগ করেছেন, ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্র-অর্থ দিয়ে সহায়তা করেছিল। ভারত ও রাশিয়া ছিল বাংলাদেশের পাশে। এখানে জোনোসাইড সংঘটিত হয়েছে, সেটা যুক্তরাষ্ট্র জানত। কিন্তু তারা ভান করছে যেন কিছুই জানে না। প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল গণহত্যাকারী পাকিস্তানের বন্ধু। এ কারণেই চোখ বন্ধ করে থাকছে।

জেনোসাইডের তথ্য জাতিসংঘে দেওয়া আছে:

কেউ কেউ বলতে চান, বাংলাদেশ একাত্তরের জোনোসাইডের বিষয়ে বিধিসম্মতভাবে ও প্রমাণসহ তথ্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় উপস্থাপন করেনি। কিন্তু বিশ্ব জানে, একাত্তরে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় সহযোগীরা অপরাধ সংঘটিত করেছে প্রকাশ্যে। সে সময়ের অনেক আন্তর্জাতিক সংবাদপত্র ও টেলিভিশন ফুটেজে এর সাক্ষ্য মিলবে। এটাও বলা প্রয়োজন যে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জেনেভাস্থ জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দ্বারা নির্যাতিত কয়েকজন ব্যক্তি চিঠি পাঠিয়েছেন। এদের একজন আবদুল করিম ১৯৭১ সালের ৮ জুন লিখেছেন, ২৬ মার্চ সকাল ১০টার দিকে ঢাকার মালিবাগের বাসায় একদল পাকিস্তানি সৈন্য তার বাবা ও ভাইকে গুলি করে হত্যা করে।

১০ জুন (১৯৭১) কুমিল্লার দাউদকান্দি থেকে চৌধুরী এবিএম কায়সার আহমদ লিখেছেন, নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলে বার্মা ইস্টার্ন কম্পানি এবং এসো কম্পানির পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নিহত শতশত মানুষের দেহ দেখেছি।

৩ জুন রমেন্দ্র চন্দ্র দে লিখেছেন, ৭ মে পাকিস্তানি আর্মি হিন্দু ও মুসলমানদের ২১টি বাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং ৩০-৩২ জনকে হত্যা করে।

কলিমুদ্দিন মিয়া জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন চেয়ারম্যানকে লিখেছেন, ২ এপ্রিল পাকিস্তানি আর্মি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরের বাড়িতে হানা দিয়ে ঘর জ্বালিয়ে দেয়, সন্তান এবং বয়স্ক মাকে গুলি করে হত্যা করে। আমার স্ত্রী আমিনা বিবিকে তারা ধরে নিয়ে যায়।

এ ধরনের চিঠিগুলো জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের জেনেভাস্থ সদর দফতরে অবশ্যই সংরক্ষিত থাকার কথা। যদি না থাকে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জেনোসাইডের সহযোগিতার দায়ে কিন্তু মানবাধিকার কমিশনকেও অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বিস্ময়। অর্থনৈতিক অগ্রগতি এমনকি উন্নত বিশ্বের অনেকের কাছেও অভাবনীয়। স্বাধীনতা অর্জনের ৫৩ বছরে যে পথ পাড়ি দিয়েছে, যেভাবে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব স্বল্পোন্নত দেশের সারি থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, যেভাবে উন্নয়নশীল দেশের সারিতে অবস্থান নিয়ে দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে উন্নত বিশ্বের কাতারে স্থান করে নিতে, যেভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে উত্তরণের রূপরেখা সুনির্দিষ্ট করেছে, যেভাবে বিশ্বের নানা প্রান্তে নিজের মর্যাদার অবস্থান ক্রমে সংহত করে চলেছে, নিশ্চিত করেই বলা যায় আমাদের এ ভূখণ্ডে জেনোসাইডের হোতা এবং তাদের সহযোগীদের দায় কোনোভাবেই এড়াতে দেওয়া হবে না। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক একাত্তরের জেনোসাইডকে অবশ্যই স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে এবং এ অপরাধে যারা যেভাবেই সংশ্লিষ্ট থাকুক না কেন, যথাযথ দণ্ড পেতে হবে। আমাদের ত্রিশ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, লাখ লাখ নারী সম্ভ্রম হারিয়েছে, প্রায় এক কোটি মানুষকে প্রাণভয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে, সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করা হয়েছে– এ অন্যায়-অপরাধ যারা করেছে তারা একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের মতোই নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করবে, ক্ষমা চাইবে। এবং অবশ্যই উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে। জেনোসাইডের দায় আন্তর্জাতিকভাবে নির্দিষ্ট করা হলে, কারা কীভাবে জড়িত তা চিহ্নিত হলে এবং উপযুক্ত দণ্ড ঘোষিত হলে কেবল সে সময়ের সংশ্লিষ্ট দেশগুলো নয়, গোটা বিশ্ব তা জানবে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেবে। এটা নিশ্চিত করার দায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়েরও। বাংলাদেশ এ জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব কিছুই করবে। মনে রাখতে হবে, মানবতাবিরোধী অপরাধ কখনও তামাদি হয় না। সভ্যতার অগ্রযাত্রার কোনা না কোনো পর্যায়ে তারা ন্যায় ও সত্যের কাছে পরাভব মানবেই। ❑

অজয় দাশগুপ্ত: বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক